ফুল ফুটুক না ফুটুক

-- সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত
শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে -
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে -
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।
গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
- তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মত
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল -
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ ! পোড়ারমুখ লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি !
তারপর দাড়ম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়িপাকানো সেই গাছ
তখন ও হাসছে।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ (১৯১৯-২০০৩) কবি, রাজনীতিবিদ। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর , ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। পিতা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন আবগারি বিভাগের প্রসিকিউটর। মাতা যামিনী দেবী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর মিত্র স্কুল থেকে প্রবেশিকা (১৯৩৭), স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আইএ (১৯৩৯) পাস করেন। এ সময় তিনি কবি সমর সেনের সান্নিধ্যে মার্কসীয় রাজনীতি ও লেবার পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪০ সালে তাঁর পদাতিক (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে তিনি শ্রমজীবী জনসাধারণের মুক্তিপ্রয়াসী কবি হিসেবে বাংলা কবিতাঙ্গনে পরিচিত হন। ১৯৪১ সালে বিএ পাস করে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ১৯৪২ সালে পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে তিনি আব্দুর রাজ্জাক, সতীশ পাকড়াশী, পারভেজ শহীদি, চারু মজুমদার, গিরিজা মুখার্জী, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে বন্দী হন। ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তি পেলে একটি প্রকাশনা সংস্থায় তিনি সাবএডিটার হিসেবে নিযুক্ত হন। এ বছরই তাঁর চিরকুট (১৯৫০) কাব্য প্রকাশিত হলে তিনি মার্কসীয় বস্তুবাদী ধারার কবিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। পরের বছর (১৯৫১) তিনি পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেবল কবি নন, গদ্য লেখক হিসেবেও ছিলেন শক্তিমান। আমার বাংলা (১৯৫১), অক্ষরে অক্ষরে (১৯৫৪), কথার কথা (১৯৫৫) প্রভৃতি গদ্য রচনায় পাওয়া যায় তাঁর মনস্বিতার পরিচয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সাংগঠনিক নেতৃত্বেও তিনি পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৯৫৮ সালে তিনি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের প্রতিটি পর্বে লক্ষ করা যায় মানবীয় বোধের উদ্বোধন। তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনায় মানুষের অসীম সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। এজন্য বলা হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সাধনা ছিল তাঁর জীবন-সাধনার অপর নাম। সমাজ , রাজনীতি, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সবকিছুর কেন্দ্রে তিনি মানুষকে স্থাপন করে জীবনের সদর্থক দিকের উন্মোচনা করেন। এ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে তোলে। কবিতাকে তিনি শ্রমশীল, উৎপাদনক্ষম মানুষের উজ্জীবনের মন্ত্র হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যিক রূপদানে আগ্রহী ছিলেন। ফলে শিল্পী হিসেবে তিনি 'Arts for Arts Sake'-এ বিশ্বাস করতেন না। তাই তাঁর কবিতায় কবি ও কর্মীর মেলবন্ধন ঘটতে দেখা যায়। তিনি কবিতায় দুর্বোদ্ধতা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করেন। কেননা তাঁর লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের চেতনাকে জাগ্রত ও শাণিত করা। সে লক্ষ্যে তিনি সমাজের সর্বস্তরে তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। তাছাড়া সারল্য কবিতার একটি প্রধান গুণ হিসেবে তিনি বিবেচনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন , সমাজের কবিকে সুবোধ্য হতে হয়। ফলে সমাজমনস্কতা এবং রাজনীতি-চেতনার স্বার্থেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি চিত্রিত হয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ফুল ফুটুক (১৯৫৭) , যত দূরেই যাই (১৯৬২) , কাল মধুমাস (১৯৬৬) , এই ভাই (১৯৭১), ছেলে গেছে বনে (১৯৭২) ও ধর্মের কল (১৯৯১) প্রধান। গদ্যগ্রন্থ: ক্ষমা নেই (১৯৭২) , খোলা হাতে খোলা মনে (১৯৮৭) প্রভৃতি। আত্মজীবনী: আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন (১৯৮৭), ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই (১৯৯৪)। উপন্যাস : হাংরাস (১৯৭২) , কে কোথায় যায় (১৯৭৬) , কাঁচা-পাকা (১৯৮৯)। উল্লেখ্য যে , কমরেড , কথা কও (১৯৯০) গ্রন্থ প্রকাশের আগে (১৯৮১) কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ থেকে তিনি অব্যাহতি নেন। ২০০৩ সালের ৮ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্মাননা

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বঞ্চনা ও অসম্মান অনেক জুটলেও সাহিত্যের অঙ্গনে সম্মানিতই হয়েছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পান ১৯৬৪ সালে ; ১৯৭৭ সালে অ্যাফ্রো-

এশিয়ান লোটাস প্রাইজ; ১৯৮২ সালে কুমারন আসান পুরস্কার; ১৯৮২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদত্ত মির্জো টারসান জেড পুরস্কার; ১৯৮৪ সালে আনন্দ পুরস্কার এবং ওই বছরেই পান সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার ও ১৯৯২ সালে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ১৯৯৬ সালে ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মাননা সাহিত্য অকাদেমী ফেলোশিপ পান সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানিত করেছিল তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম দ্বারা।

এছাড়াও প্রগ্রেসিভ রাইটার্স ইউনিয়নের ডেপুটি সেক্রেটারি ও ১৯৮৩ সালে অ্যাফ্রো-এশীয় লেখক সংঘের সাধারণ সংগঠক নির্বাচিত হন কবি। ১৯৮৭ সাল থেকে তিনি ছিলেন সাহিত্য অকাদেমীর একজিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য।

গ্রন্থাবলি

কাব্যগ্রন্থ

পদাতিক (১৯৪০), অগ্নিকোণ (১৯৪৮), চিরকুট (১৯৫০), ফুল ফুটুক (১৯৫৭), যত দূরেই যাই (১৯৬২), কাল মধুমাস (১৯৬৬), এই ভাই (১৯৭১), ছেলে গেছে বনে (১৯৭২), একটু পা চালিয়ে ভাই (১৯৭৯), জল সইতে (১৯৮১), চইচই চইচই (১৯৮৩), বাঘ ডেকেছিল (১৯৮৫), যা রে কাগজের নৌকা (১৯৮৯), ধর্মের কল (১৯৯১)।

কবিতা সংকলন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৮১ বঙ্গাব্দ), কবিতাসংগ্রহ ১ম খণ্ড (১৯৯২), কবিতাসংগ্রহ ২য় খণ্ড (১৯৯৩), কবিতাসংগ্রহ ৩য় খণ্ড (১৯৯৪), কবিতাসংগ্রহ ৪র্থ খণ্ড (১৯৯৪)।

অনুবাদ কবিতা

নাজিম হিকমতের কবিতা (১৯৫২), দিন আসবে (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, নিকোলো ভাপৎসারভের কবিতা), পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ), ওলঝাস সুলেমেনভ-এর রোগা ঈগল (১৯৮১ বঙ্গাব্দ), নাজিম হিকমতের আরো কবিতা (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ), পাবলো নেরুদার আরো কবিতা (১৩৮৭ বঙ্গাব্দ), হাফিজের কবিতা (১৯৮৬), চর্যাপদ (১৯৮৬), অমরুশতক (১৯৮৮)।

ছড়া

মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো (১৯৮০)।